ইসলামি অর্থব্যবস্থার ইতিহাস

মূল

আহমেদ আল আশকার
রডনি উইলসন

অনুবাদ

আশিক আরমান নিলয়

সম্পাদনা ও পরিমার্জন

আহমদ সালেম নকি
মাহমুদ সালমান জকি

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১৭
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ১৯
সম্পাদকের কথা ২০

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম-পূর্ব আরব

ভূমিকা ২৩
বাইবেলীয় সূত্র থেকে ২৪
ভৌগোলিক অবস্থা ও জনপ্রকৃতি ২৬
সামাজিক সংগঠন এবং বসতির ধরন ২৭
বেদুইনদের বৈশিষ্ট্য ২৮
সহ্যক্ষমতা: ২৮
ব্যক্তিস্বার্থ: ২৯
গোত্রবাদ: ৩০
আতিথেয়তা: ৩১
অর্থনৈতিক ফায়দার উদ্দেশ্যে আক্রমণ: ৩২
বীরত্ব এবং সংঘাতের প্রতি আগ্রহ: ৩৩
আরব সভ্যতাসমূহ ৩৪
দক্ষিণ আরব ৩৪
• সাবা ৩৫
• মা'ইন ৩৬
• কাতাবান এবং হাদরামাউত ৩৬
• বিশ্বাস ও ভাগ্যের পরিবর্তন ৩৬
উত্তর আরব ৩৯
• নাবাতীয় ৩৯
• পালমিরীয় ৪০

• গাসসানি ৪১
• লাখমি ৪১
• কিন্দি ৪২
মধ্য আরব ৪৩
মক্কার বাণিজ্য ও অর্থনীতি ৪৫
ইসলামে বেদুইন ৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি রাষ্ট্রের জন্ম : কুরআন-সুন্নাহর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

ভূমিকা ৫৫
ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তার উৎসসমূহ ৫৭
আল-কুরআন ৫৭
সুন্নাহ ৫৯
ফিকহ ৬১
ইসলামি অর্থনৈতিক ধারণাসমূহ ৬৩
১. একত্ব বা তাওহিদ ৬৩
২. খিলাফাত বা প্রতিনিধিত্ব ৬৪
৩. আমানাহ বা স্বাধীন ইচ্ছা ও দায়িত্বভার ৬৫
পুরস্কার ও শাস্তির বিধান ৬৬
ইসলামি অর্থনৈতিক মূলনীতিসমূহ ৬৭
ক. ইতিদাল বা মধ্যমপন্থার নীতি ৬৭
খ. অর্থনৈতিক কর্মদক্ষতার নীতি ৬৭
গ. আদালাহ ইজতিমাইয়্যা বা সামাজিক ন্যায়বিচার ৭০
মৌলিক দর্শনের প্রয়োগ ৭০
অর্থনৈতিক সম্পদ : সংজ্ঞা ও দৃষ্টিকোণ ৭২
ক. প্রাকৃতিক সম্পদ ৭৩
খ. শ্রম ৭৩
গ. মূলধন ৭৬
মূলধনের দর ৭৬
রিবা অর্থ ৭৯
• ১) ভাষাগত অর্থ: ৭৯

• ২) কুরআনে উল্লেখ: ৮০
• ৩) সুন্নাহতে উল্লেখ: ৮০
রিবার প্রকারভেদ ৮২
• প্রথম: ঋণ রিবা ৮২
• দ্বিতীয়: বিক্রয় রিবা বা রিবাল বুয়ু ৮২
অর্থনৈতিক সম্পদ : মালিকানার ধরন ৮৪
মালিকানার ভিত্তি ৮৪
মালিকানার প্রকারভেদ ৮৫
• ব্যক্তিগত মালিকানা ৮৫
• গণ-মালিকানা ৮৭
অর্থনৈতিক সম্পদ : অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদন ৯০
অর্থনৈতিক দক্ষতা ৯০
উৎপাদনের লক্ষ্যসমূহ ৯১
উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ ৯২
অর্থনৈতিক সম্পদ : ভোগ ৯৫
ইসলাম ও বস্তুগত প্রয়োজনাদি ৯৫
আচরণগত বিষয়াদি ৯৫
মধ্যমপন্থা নীতি ৯৮
সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যকার সম্পর্ক ১০১
• ১. সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য ১০১
• ২. যাকাত ১০২
• ৩. লাভ ও সুদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ১০৩
অর্থনৈতিক সম্পদ : আয় বণ্টন ১০৪
• ১. ঐচ্ছিক দান-সদাকা ১০৬
• ২. যাকাতের বিধান প্রয়োগ ১০৭
• ৩. উত্তরাধিকার আইনের বাস্তবায়ন ১০৯
অর্থনৈতিক সম্পদ : রাষ্ট্রের ভূমিকা ১১১
• প্রথমত: উদ্যোক্তা হিসেবে রাষ্ট্র ১১২
• দ্বিতীয়ত: বাজার কাঠামো ১১২
• তৃতীয়: রাষ্ট্রের অর্থায়ন ১১৫
রাষ্ট্রীয় রাজস্ব ১১৬
• ফাই এবং আনফাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) ১১৬
• খুমুস: গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ ১১৮

• যাকাত ১১৯
• জিযিয়া ১২০
কুরআন-সুন্নাহর অর্থনীতি এবং বর্তমান যুগ ১২১

তৃতীয় অধ্যায়
খুলাফায়ে রাশিদীনের অর্থনৈতিক দর্শন

ভূমিকা ১২৪
খিলাফত ১২৫
প্রথম খলিফা আবু বকর ﵁ (৬৩২–৬৩৪) ১২৭
ধর্মত্যাগ এবং ইসলামি যাকাতব্যবস্থা ১২৮
দ্বিতীয় খলিফা উমর ﵁ (৬৩৪–৬৪৪) ১৩১
মানুষ হিসেবে খলিফা উমর ১৩১
খলিফা উমরের আমলে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারণ ১৩৪
দ্বিতীয় খলিফা উমরের অর্থনৈতিক চিন্তা ১৩৫
• অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানা ১৩৫
• অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৩৯
• সম্পদ বণ্টন ১৪২
• কর কাঠামো ১৪৩
• রাষ্ট্রীয় ব্যয় ১৪৭
• রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ১৪৮
তৃতীয় খলিফা উসমান ﵁ (৬৪৪–৬৫৬) ১৫০
মানুষ হিসেবে খলিফা উসমান ১৫০
খলিফা উসমান এবং আর্থিক প্রশাসন ১৫১
চতুর্থ খলিফা আলি ﵁ (৬৫৬–৬৬১) ১৫৩
মানুষ হিসেবে খলিফা আলি ১৫৪
চতুর্থ খলিফা আলির অর্থনৈতিক চিন্তা ১৫৫
• সরকারের সাধারণ কার্যাবলি ১৫৫
• সমাজ-কাঠামো ১৫৫
• জনপ্রশাসন বিভাগ ১৫৭
• সমাজের সমৃদ্ধি ১৫৮

চতুর্থ অধ্যায়
বংশীয় খিলাফত

ভূমিকা **১৬০**
খিলাফত এবং রাজবংশ **১৬০**
ইসলামি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ এবং প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ১৬৩
প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার **১৬৪**
ডাকসেবার প্রচলন **১৬৪**
রাষ্ট্রীয় নিবন্ধন দপ্তর **১৬৫**
রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের আরবিকরণ **১৬৭**
মুদ্রাব্যবস্থা সংস্কার ১৬৮
ইসলামি নগরায়ণ ১৬৯
কৃষি **১৭১**
ব্যবসা ও বাণিজ্য ১৭৪
ব্যবসার বৈধ ধরনসমূহ ১৭৭
রাষ্ট্রের অর্থায়ন ১৮০
প্রথম: কর-বহির্ভূত আয় ১৮১
- ফাই ১৮১
- সাওয়াফি ভূমি, রাজ-ভূসম্পত্তি বা জায়গীর ১৮১
- ব্যবসা ও সরকারি খাতের রাজস্ব ১৮৩

দ্বিতীয়ত: কর ১৮৪
- গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) ১৮৪
- যাকাত ১৮৪
- জিযিয়া ১৮৪
- খারাজ ১৮৫
- অন্যান্য কর ১৮৬

পঞ্চম অধ্যায়
আব্বাসি স্বর্ণযুগ

ভূমিকা **১৮৯**
ইসলামি অর্থনীতির বিশেষায়িত কর্মকাণ্ড **১৮৯**
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান পরিবর্তনসমূহ **১৯২**
রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান সম্পদ ১৯২
উৎপাদিত দ্রব্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্য ১৯৩

ভূমি মালিকানার কাঠামো পরিবর্তন ১৯৫
কর সংগ্রহে মধ্যবর্তী প্রতিনিধি সংযোজন ১৯৬
বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ১৯৬
ইসলামি ধর্মীয়-রাজনৈতিক দর্শন ১৯৬
গ্রিক দর্শনের সমালোচনা ১৯৮
ইসলামি ফিকহের বিকাশ ১৯৮
ফিকহি মাযহাব ২০১
ইসলামি অর্থনীতির প্রথম বিশেষায়িত কিতাব ২০৩
খারাজ বিষয়ক রচনা ২০৩
• খারাজের অর্থ ২০৩
• খারাজ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ২০৪
কিতাবুল খারাজ ২০৫
গ্রন্থ-পর্যালোচনা ২০৮
• সামগ্রিক রচনাপদ্ধতি ২০৮
• বইটির গঠনকাঠামো ২০৯
• ভূমিকা ২১০
• রাষ্ট্রের ব্যয়ভার এবং রাজস্বের বণ্টন ২১০
• ভূমিকর ২১১
• খারাজ ২১২
• মুকাসামার অর্থনৈতিক প্রভাব ২১৯
• উশর ২২০
• মুসলিমদের হাতে থাকা জমি ২২০
• আরবের আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন জমি ২২১
• কাতাই ভূমি ২২২
• পুনর্জীবিত অনাবাদি জমি ২২৩
• ভূমিকরের ব্যবস্থাপনা ২২৪
• আহরিত পণ্যের ওপর অন্যান্য কর ২২৫
• যাকাত ২২৬
• জিযিয়া ২২৭
• শুল্ক মাশুল ২২৮
• জনপ্রশাসন “আইন ও শৃঙ্খলা” ২২৯
• অন্যান্য বিষয় ২২৯
• মুজারাআ বা ইজারা ২২৯
• সরকারি ও বহিরাগত পণ্যসমূহ ২৩১
• দাম, ঘাটতি ও মান ২৩১

আল-ইকতিসাব ফির রিযকিল মুসতাত্বাব.....২৩৩
লেখক.....২৩৩
গ্রন্থ পর্যালোচনা.....২৩৪
ভোগ ও উপার্জন.....২৩৪
• ১. জীবিকা বা নিত্যপ্রয়োজনীয়ের পর্যায় ২৩৪
• ২. মধ্যমপন্থার পর্যায় ২৩৫
• ৩. অপব্যয়ের পর্যায় ২৩৬
উৎপাদন ও উপার্জন.....২৩৬
• ইজারা.....২৩৬
• শিল্পকারখানা ২৩৮
• কৃষি ২৩৯
• বাণিজ্য.....২৪০
• অন্যান্য বিষয়.....২৪১
কিতাবুল আমওয়াল, সম্পদ-সংক্রান্ত গ্রন্থ ২৪২
লেখক.....২৪৩
গ্রন্থ পর্যালোচনা.....২৪৩
ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তায় সুফিবাদের অবদান ২৪৫
সুফি আন্দোলনের বিকাশ ২৪৫
সুফিবাদের অর্থনৈতিক প্রভাব.....২৫০
'আল-মাকাসিব ওয়াল ওয়ারা' ২৫২
গ্রন্থকার ২৫২
গ্রন্থ পর্যালোচনা.....২৫৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজনৈতিক বিভক্তি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

ভূমিকা.....২৬০
রাজনৈতিক ভেদাভেদ.....২৬০
আলাভি আন্দোলন ২৬১
আরব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ২৬৩
অনারব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন.....২৬৪

• ক. পারস্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ২৬৪
• খ. তুর্কি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ২৬৭
খিলাফতের পতন ও পুনরুদ্ধার ২৬৯
বুদ্ধিবৃত্তিক বৈচিত্র্য ২৭০
আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা ২৭৩
গ্রন্থকার ২৭৩
গ্রন্থ পর্যালোচনা ২৭৪
• গ্রন্থটির প্রধান উদ্দেশ্য ২৭৫
আয-যারিআহ ইলা মাকারিমিশ শারীআহ ২৭৮
গ্রন্থকার ২৭৮
গ্রন্থের আলোচনা ২৭৯
বইটির প্রধান বিষয়গুলো ২৮০
• ক. মানবীয় চাহিদাসমূহ: ভোগ ২৮০
• খ. মানবীয় ভূমিকা: উৎপাদন ২৮১
• গ. সমাজে মানুষ: সহযোগিতা ২৮৩
• ঘ. অর্থনৈতিক দক্ষতায় মানুষ: বিশেষ দক্ষতা ২৮৩
• ঙ. অর্থনৈতিক কার্যক্রমে মানুষ: অর্থনৈতিক সমন্বয় ২৮৩
• চ. মানুষ ও মনস্তত্ত্ব: কর্মের উদ্দীপনা ২৮৪
• ছ. মানুষ ও মুদ্রা ২৮৫
ইহ্ইয়া উলুমিদ্দীন : ধর্মীয় জ্ঞানের জাগরণ ২৮৬
গ্রন্থকার ২৮৬
লেখক ২৮৭
গ্রন্থের আলোচনা ২৮৭
• ক. জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ২৮৮
• খ. মুদ্রা ২৮৯
• গ. শিল্পসমন্বয় ২৯১
• ঘ. ভোগ ও ভোক্তার আচরণ ২৯২
• ঙ. উপার্জন: ব্যবসা ও বাণিজ্য ২৯৩
আল-ইশারা ইলা মাহাসিনিত তিজারা ২৯৫
গ্রন্থকার ২৯৫
গ্রন্থের আলোচনা ২৯৬
• ক. সম্পদ ২৯৬
• খ. সম্পদের উৎসসমূহ ২৯৭
• গ. শ্রম ২৯৮
• ঘ. মুদ্রা ২৯৮

• ঙ. উৎপাদনের ব্যয় ও মূল্য ২৯৯
• চ. চাহিদা, জোগান ও দাম ২৯৯
• ছ. মূল্যবৈষম্য ৩০০
• জ. মুনাফা সন্তুষ্টিকরণ ও ব্যবসায়িক লক্ষ্য ৩০১
হিসবাহ প্রবর্তন এবং ব্যবসা খাতের তদারকি ৩০২
হিসবাহ সংক্রান্ত লেখালেখি ৩০৩
মাআলিমুল কুরবাহ ফি আহকামিল হিসবাহ ৩০৫
গ্রন্থকার ৩০৫
গ্রন্থের আলোচনা ৩০৫
আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম: ইসলামে জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ৩১১
গ্রন্থকার ৩১১
গ্রন্থের আলোচনা ৩১১
মূল্য নিয়ন্ত্রণ ৩১৩
অত্যাবশ্যক জোগান নিশ্চিতকরণ ৩১৫
মুকাদ্দিমা ইবনু খালদুন ৩১৬
গ্রন্থকার ৩১৬
গ্রন্থের আলোচনা ৩১৭
• মুকাদ্দিমা রচনায় তার গৃহীত পদ্ধতি ৩১৭
ইবনু খালদুনের অর্থনৈতিক চিন্তা ৩১৯
• ক. অর্থনৈতিক সমন্বয় ৩১৯
• খ. শাসক (সরকার) কর্তৃক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ৩১৯
• গ. উন্নয়ন, ভোগ, শ্রম ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ৩২০
• ঘ. দর ৩২২
• ঙ. শ্রমের দর ৩২৩
• চ. উপার্জন, আয়, পুঁজি ও মূল্য ৩২৩
• ছ. বাণিজ্য ৩২৫
• জ. আর্থিক ঝুঁকি ৩২৬

সপ্তম অধ্যায়

তিন সাম্রাজ্য এবং ইসলামের ফিনিক্স পাখি

ভূমিকা ৩২৮
উসমানী সাম্রাজ্য ৩২৯
খিলাফতের উসমানীকরণ ৩৩০

উসমানীয়দের অধীনে ইসলামি রচনা ও গবেষণা ৩৩২
আরবি ভাষার আনুষ্ঠানিক ব্যবহার কমে আসা ৩৩৪
ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া ৩৩৫
পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তির অনুপ্রবেশ ৩৩৭
সেক্যুলার ধারার অনুকরণে ধর্ম ও ইসলামি সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্নকরণ ৩৩৮
আইন-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের প্রতি পৃষ্ঠপোষণের অভাব ৩৩৯
উসমানী সাম্রাজ্যের পতন ৩৪২
• অর্থনৈতিক অবক্ষয় ৩৪২
• অপশাসন ৩৪২
• উত্তমাশা অন্তরীপের আবিষ্কার ৩৪৪
• পশ্চিমা বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ৩৪৪
সাফাভি সাম্রাজ্য ৩৪৬
সাফাভিদের অধীনে আলিমগণের ভূমিকা ৩৪৭
সাফাভিদের অধীনে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ৩৪৮
মঙ্গোল সাম্রাজ্য ৩৫০
ভারতীয় উপমহাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ৩৫১
• বাদশাহ আকবরের ধর্মীয় দর্শন ৩৫২
• শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৩৫৩
শাহ ওয়ালিউল্লাহর অর্থনৈতিক চিন্তা ৩৫৬

অষ্টম অধ্যায়

আধুনিকায়ন ও ইসলামিকরণের সংকট : সংস্কার থেকে পুনর্জাগরণ

ভূমিকা ৩৬২
প্রথম : ট্র্যাডিশনাল সংস্কার আন্দোলন ৩৬৩
ওহাবি আন্দোলন ৩৬৩
ইদরিসি আন্দোলন ৩৬৫
সানুসি আন্দোলন ৩৬৫
মাহদি আন্দোলন ৩৬৬
দ্বিতীয় : দফারফার সংস্কার আন্দোলন ৩৬৬
মিশরের সংস্কারকবৃন্দ ৩৬৭
আবদুহু ও আফগানি ৩৬৮
হাসান আল-বান্না এবং ইখওয়ানুল মুসলিমীন ৩৭১
ভারতবর্ষের সংস্কারকবৃন্দ ৩৭২

• মুহাম্মাদ ইকবাল ৩৭২
• আবুল আলা মওদুদি এবং জামাতে ইসলামি ৩৭৩
তৃতীয় : সেক্যুলারপন্থি সংস্কার আন্দোলন ৩৭৪
তাহা হুসাইন ও সেক্যুলারায়নের ডাক..... ৩৭৫
ইসলামি অর্থনীতির বিজয় : পুনর্জাগরণ..... ৩৭৬
পুনর্জাগরণবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য..... ৩৭৭
• ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য: ইসলামি চর্চার পুনর্জাগরণ..... ৩৭৮
• সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্থা ৩৭৮
• অর্গ্যানাইজেশান অব ইসলামিক কনফারেন্স ৩৭৮
• ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) ৩৭৯
• কিছু মুসলিম দেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ইসলামিকরণ..... ৩৮২
• ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন ৩৮৩
বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ..... ৩৮৬
দ্য ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ইসলামিক ইকোনমিকস..... ৩৮৬
ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকোনমিকস (ICRIE)..... ৩৮৮
ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (IRTI) ৩৮৯
ইন্টারনাশন্যাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট (IIIT) ৩৯০
দ্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন (যুক্তরাজ্য) ৩৯২
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (মালয়শিয়া)..... ৩৯২
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (ইসলামাবাদ) ৩৯৩

নবম অধ্যায়

ইসলামি অর্থনীতির রেনেসাঁ : বিংশ শতাব্দীতে ইসলামি অর্থনীতি

ভূমিকা..... ৩৯৭
প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ..... ৩৯৯
ব্যক্তিগত নিয়ামক..... ৪০০
পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ..... ৪০১
ধর্মীয় সংস্থাসমূহ..... ৪০৪
মুসলিম শিক্ষার্থীসংস্থা ৪০৪
নিবেদিত প্রকাশনা সংস্থাসমূহ..... ৪০৫
যেসব টপিকের ওপর কাজ হয়েছে ৪০৬
১. যাকাত ও কর ৪০৬
২. রিবা বা সুদ উৎখাত..... ৪১৬

• সুদমুক্ত ব্যাংকিং ৪১৭
• মুদ্রাগত ও আর্থিক নীতিমালা এবং ইসলামি সম্পদ বণ্টন..... ৪১৯
৩. ইসলামি অর্থনৈতিক তত্ত্ব, নৈতিকতা ও অর্থনীতি ৪২২
৪. ভোক্তার আচরণ ৪২৮
৫. বীমা.....৪৩২
৬. মুসলিম দেশসমূহের মাঝে অর্থনৈতিক সহযোগিতা.....৪৩৪
৭. সূচক ৪৪০
৮. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৪৪২
ইকতিসাদুনা : আমাদের অর্থনীতি.....৪৪৬
ইসলামি অর্থনীতির ভবিষ্যৎ ৪৫৩
পরিভাষা.....৪৬৩
গ্রন্থপঞ্জি..... ৪৭৯

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম-পূর্ব আরব

কাব্য, গোত্রীয় দ্বন্দ্ব এবং বীরত্ব
(খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০-৬১০ খ্রিষ্টাব্দ)

ভূমিকা

তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে ইসলামপূর্ব আরব নিয়ে গবেষণা করা কঠিন কাজ। কিন্তু অধ্যয়ন যতই অপূর্ণাঙ্গ থাকুক, ইসলামি সভ্যতার গবেষকের জন্য এ কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নদীর ধারে, পানির একটি স্থায়ী উৎসের সাহায্য নিয়ে। ইসলামি সভ্যতা এদিক থেকে ব্যতিক্রম। এর উদ্ভব হয়েছে এক শুষ্ক মরুভূমিতে। ইসলামের আঁতুড়-ঘর আরবে সেরকম পর্যাপ্ত জাতীয় সম্পদ ছিল না, যা একটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। প্রাচীন ইতিহাসে আরবের যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তাতে চূড়ান্ত ভূমিকাটা ইসলামই পালন করেছে। ইসলাম এখানকার অধিবাসীদের একটি দ্বীনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে একক জাতিতে পরিণত করে। প্রশস্ত ও ধারাবাহিক বৈশ্বিক বিজয়ের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করে। ধর্মীয় প্রভাবকটা এখানে যথেষ্ট তীব্র। কাজেই, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেকার আরবের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তিনটি প্রধান কারণে গুরুত্বপূর্ণ:

➡ (ক) সেই সভ্যতা কতটা বিকশিত হয়েছিল, তার পরিমাণ যথাসম্ভব নিরীক্ষা করা,

➡ (খ) ইসলামের উদ্ভবের সময়ে এই সভ্যতাটির কতটুকু অস্তিত্ব ছিল এবং ইসলামি চিন্তার ওপর এটি কতটুকু প্রভাব বিস্তার করার দাবি করতে সক্ষম, তা অনুসন্ধান করা, এবং

➡ (গ) প্রাথমিক ইসলামি অর্থচিন্তার ওপর ইসলাম-পূর্ব আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা।

বাইবেলীয় সূত্র থেকে

'আরব' শব্দটির শব্দগত উৎস প্রাচীন ইতিহাসে নিহিত। বাইবেলীয় উৎস অনুযায়ী, শব্দটির একটি সেমিটিক উৎসের কথা জানা যায়। এটি এসেছে হিব্রু মূল শব্দ 'আরাভি' থেকে, যার অর্থ 'শুষ্ক' (Aid to Bible Understanding, 1971)। আরবকে শুষ্ক ভূমি বা 'মরু প্রান্তর' (ইসাইয়া ২১: ১৩) হিসেবে উল্লেখ করলে শব্দটির বাইবেলীয় অর্থ ফুটে উঠে। তা ছাড়া এ শব্দটি 'আরাবাহ' শব্দেরই আরেকটি সংস্করণ হতে পারে, হিব্রু ভাষায় যার অর্থও অনুরূপ: মরু প্রান্তর (দ্বিতীয় বিবরণ ৩: ৭, যিহোশূয় ৩: ১৬, ১১: ১৬ এবং জেরেমিয়া ৫২: ৭)। বাইবেলীয় এই অর্থ যদিও গ্যালিলি হ্রদ থেকে নিয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু শুষ্ক ভূমি বা মরু প্রান্তর হিসেবে আরব বা আরাবাহ'র এই সংজ্ঞার ভেতরে ইয়েমেনের উত্তর দিক পর্যন্ত সকল শুষ্ক ভূমিই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উপদ্বীপের কেন্দ্রে অবস্থানকারী ভূমি শুষ্কতা বা পানির উৎসের অভাবের দিক দিয়ে বাইবেলে উল্লেখিত সেই অঞ্চলের তুলনায় কোনো দিক দিয়ে কম, এমনটা ভাবার কোনো প্রমাণ নেই।

আরবজাতির উদ্ভবের ব্যাপারেও বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে। কিছু গোত্র ছিল সেমিটিক, যারা নূহ ﷺ-এর ছেলে শেম বা সেম (সেখান থেকে সেমিটিক) থেকে জোকতানের বংশে উদ্ভূত। অপর কিছু গোত্র হেমিটিক, যাদের উদ্ভব নূহ ﷺ-এর ছেলে হেম থেকে কুশের বংশে (আদি পুস্তক ১০: ৬, ৭, ২৬–৩০)। ছেলে ইসমাঈল ﷺ-এর মাধ্যমে নবি ইবরাহীম ﷺ-এর কিছু বংশধরও আরবে বসবাস করে এবং 'অস্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলে মিশরের কাছে শুরের নিকট হাভিলা থেকে অ্যাসিরিয়া পর্যন্ত এলাকায়' (আদি পুস্তক ২৫: ১–৪, ১২–১৮)। সাঈরের পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী (ফিলিস্তিনে অবস্থিত) ইসাউ'র বংশধররাও সাধারণভাবে আরবের সংজ্ঞার ভেতর আসে (আদি পুস্তক ৩৬: ১–৪৩, Aid to Bible Understanding, 1971)। তবে সাধারণভাবে আরবদের বোঝাতে বাইবেলে ব্যবহৃত পরিভাষা হলো ইসমাঈলীয়। কারণ ইহুদিরা আরবদেরকে ইবরাহীমেরই আরেক ধারার বংশধর হিসেবে দেখত। আর তাদের (ভুল ধারণা) মতে, ইসহাকের জন্মের ফলে বড় ছেলে ইসমাঈল প্রতিশ্রুত ভূমির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর মর্যাদা থেকে ছিটকে পড়েন (পিটার ম্যানসফিল্ড, ১৯৮২)।

প্রথম যুগের মুসলিম বা আরবগণ নিজেদেরকে ইসমাঈলের বংশধর হিসেবে মানে। ইসমাঈলের বাবা ইবরাহীমকে ধরা হয় একেশ্বরবাদীদের পিতা হিসেবে। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, নবি ইবরাহীম ﷺ তাঁর মিশরীয় দ্বিতীয় স্ত্রী হাজার ও তাঁর

গর্ভের ছেলে ইসমাঈলকে মক্কা উপত্যকায় নিয়ে এসেছিলেন। তারপর যৎসামান্য খাবারদাবার-সহ তাঁদেরকে সেখানেই রেখে চলে যান। তারপর ইবরাহীম ﷺ একক সত্য উপাস্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কতিপয় সন্তানকে আপনার সম্মানিত ঘরের আশেপাশে এমন এক উপত্যকায় এনে বসবাস করিয়েছি, যেখানে কোনো ক্ষেত-খামার নেই। হে আমার প্রতিপালক! এটি করেছি যাতে তারা নামাজ কায়েম করে। কাজেই আপনি লোকদের মনকে এদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং ফল-ফলাদি দিয়ে এদের আহারের ব্যবস্থা করুন, হয়তো এরা শোকরগুজার হবে।' (সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৩৭)। আদি পুস্তক অনুযায়ী, নবি ইবরাহীমকে আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। 'তোমার ক্রীতদাসী ও তার সন্তানের বিষয়ে তুমি এত ব্যথিত হোয়ো না। আমি ওই ক্রীতদাসীর ছেলে হতেও একটি জাতি উৎপন্ন করব, কারণ সেও তোমার বংশধর।' (আদি পুস্তক ২১: ১৩)। কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও বাইবেলীয় ও কুরআনীয়—উভয় সংস্করণেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁদেরকে পানি ও নানা অনুগ্রহ দিয়ে চলেন। শিশুটি মক্কা উপত্যকায়, পারানের ঊষর অঞ্চলে বড় হতে থাকে এবং তিরন্দাজে পরিণত হয়।[১]

ঘটনার বাকি অংশ ইসলামি আন্দোলনের জন্য আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম-পূর্ব আরবের অর্থনীতিতে এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামের ইতিহাস বলে, আল্লাহর দেওয়া একটি পানির উৎস ইসমাঈলের পায়ের নিচ থেকে বেরিয়ে আসে। হাজার ﷺ এটিকে হাত দিয়ে থামানোর চেষ্টা করেন, যেন তা বালুরাশির দিকে চলে না যায়। মুখে বলতে থাকেন, 'যাম-যাম', অর্থাৎ থামো এবং জড়ো হও। পরবর্তীকালে পবিত্র এই পানির উৎসের নামই হয়ে যায় যামযাম। এখন পর্যন্ত এ নামেই একে ডাকা হয়। ইবরাহীম ﷺ যখন তাঁদের খোঁজ নিতে ফিরে আসেন, তখন দেখতে পান বেদুইনরা[২] এই পানির উৎসকে ঘিরে জনবসতি গড়ে তুলেছে। ইসমাঈল ﷺ-কে সাথে নিয়ে তিনি সত্যিকার একক উপাস্যের ইবাদতখানা হিসেবে কাবা নির্মাণ করেন। মক্কার এই পবিত্র ঘর-কেন্দ্রিক এলাকার কেন্দ্রবিন্দু

---

[১] সূরা বাকারা, সূরা ইবরাহীম-সহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের শৈশব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সহীহ বুখারির (৩৩৬৪, ৩৩৬৫) বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তিনি তিরন্দাজ ছিলেন এবং শিকারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। - সম্পাদক

[২] সহীহ বুখারির (২৩৬৮, ৩৩৬৪) বর্ণনা থেকে জানা যায়, জুরহুম গোত্র মক্কার সেই অঞ্চল অতিক্রম করার সময় পানির উৎসের সন্ধান পেয়ে হাজার ﷺ-এর অনুমতি নিয়ে বসতি স্থাপন করে। জুরহুম গোত্র ছিল আরব আরিবাহর অন্তর্ভুক্ত। তাদের আদি বসতি ছিল ইয়েমেনে। দ্রষ্টব্য: আখবারু মাক্কাহ (২/৯), আল-ইকদুল ফারীদ (৩/৩১৯) মুজামু কাবায়িলিল আরব (১/১৮৩)। - সম্পাদক

হিসেবে কাজ করেছে এই পানির উৎস। ইসলামের আবির্ভাবের পরে যেমন, তেমনি এর আগেও হজযাত্রীরা একে সমীহ করে এসেছে। তখন থেকেই হজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে আরব উপদ্বীপের জীবনে।

ভৌগোলিক অবস্থা ও জনপ্রকৃতি

মোটাদাগে হিসেব করলে আরব অঞ্চলকে ভৌগোলিকভাবে তিনটি আলাদা অংশে ভাগ করা যায়—উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ। এই পুরোটা অঞ্চল জুড়েই আরব উপদ্বীপ। এটি উত্তরদিকে ফিলিস্তিনের দক্ষিণাংশ থেকে শুরু হয়ে পূর্বদিকে পারস্য ও ওমান উপসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে এর শেষ সীমানা। এ এক বিশাল ভূমি। আকারে ইউরোপের এক-চতুর্থাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশের সমান। ভূমির প্রকৃতি এবং প্রাচীন আরবে গড়ে ওঠা সভ্যতার স্তরের ভিত্তিতে উপদ্বীপকে এই তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। উত্তর আর দক্ষিণ অংশ ছিল উর্বর ভূমিতে পরিপূর্ণ। এর ফলে টেকসই অর্থনীতির বিকাশ সম্ভব হয় এবং এর সহায়তায় গড়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা (Della Vida, 1944)। কিন্তু কিছু ছড়ানো ছিটানো মরুদ্যানের কথা বাদ দিলে মধ্যাংশটি ছিল একেবারেই শুষ্ক। ইসলামের আবির্ভাব হয় এখানেই। কয়েক শতাব্দী যাবৎ ইসলামের বিজয়রথের নেতৃত্ব দিয়েছে আরবদের যে জনগোষ্ঠী, তাদের বসতিও এই এলাকাটিই। উত্তর বা দক্ষিণের সাথে তুলনীয় কোনো সভ্যতা যে এখানে গড়ে উঠেছিল, এমনটা বলার মতো কোনো প্রমাণই পাওয়া যায়নি।

কিন্তু মধ্য-আরব কি চিরকালই শুষ্ক ছিল? সেমিটিক জাতির উদ্ভব ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে একটি 'তত্ত্ব' আবিষ্কার করার জন্য ইতিহাসবিদগণ এই প্রশ্নটি করেছেন। শুকিয়ে যাওয়া নদীতলকে বলে 'ওয়াদি'।[১] এগুলোর অস্তিত্ব থেকে ধারণা করা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক আরব ছিল উর্বর ভূমি। সেখানে মানুষ বসবাস করতে পারত। তারপর ইতিহাস শুরুর আগ পর্যন্ত এটি ক্রমাগত শুষ্ক হতে থাকে (প্রাগুক্ত)। শুষ্ক

[১] ওয়াদি/ভ্যালি এর বাংলা প্রতিশব্দ উপত্যকা। উপত্যকা হলো একটি দীর্ঘায়িত নিম্ন এলাকা যা দুটি পাহাড় বা পর্বতশ্রেণির মধ্যে অবস্থিত। পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত উপত্যকাগুলো সমতল বা অসমতল হতে পারে। এর ভেতর দিয়ে নদী প্রবাহিত হতেও পারে, না-ও পারে। বরফ গলা পানি বা বৃষ্টি যখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুতবেগে নেমে আসে, তখন বছরের পর বছর পাহাড়ের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উপত্যকার সৃষ্টি হয়। আবার কখনো কখনো কোন নদী গতিপথ বদলালে এর পুরাতন অববাহিকাটি উপত্যকার জন্ম দেয়। আবহমান কাল ধরে মরু-আরবে উপত্যকা পানির অন্যতম উৎস, কারণ তা বৃষ্টির পানিকে দীর্ঘদিন ধরে রাখে। সারকথা, উপত্যকা শুকিয়ে যাওয়া নদীর নিশ্চিত আলামত নয়। - সম্পাদক

নদীতল বা 'ওয়াদি' মধ্য-আরবে বাণিজ্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করেছে। দক্ষিণ ও উত্তরের মাঝে বাণিজ্যিক পথ হিসেবে কাজ করত এগুলো। প্রতিকূলতম এক ভূমিতে সেগুলো অনুকূলতম পথ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক মধ্য আরবের ভূমিপ্রকৃতি যেমন এক অমীমাংসিত রহস্য, সেই ভূমির আদি অধিবাসীদের উৎপত্তি-রহস্যও তা-ই। তারা কি পুরোপুরিই সেমিটিক ছিল, নাকি অসেমিটিক মিশ্রণও ছিল—এই প্রশ্নটি নৃবিজ্ঞানীদের মাঝে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। হেমিটিক ও সেমিটিক ভাষার মাঝে কিছুটা সম্পর্ক বিদ্যমান। এখান থেকে এই অনুমানের প্রতি সমর্থন মেলে যে, আদিবাসীরা আফ্রিকা থেকে এসে থাকবে হয়তো। পক্ষান্তরে হেমিটো-সেমিটিক, ইন্দো-ইউরোপীয় ও ইউরাল-অলটাইক ভাষার মাঝে সাদৃশ্য থেকে আবার মনে হয় যেন আদি অধিবাসীরা উত্তর দিক থেকে আগত (প্রাগুক্ত)। বাইবেলীয় উৎসগুলো বলে যে, কিছু অধিবাসী শেমের এবং কিছু অধিবাসী হেমের বংশধর। নূহ ﷺ-এর এই দুই ছেলে আরবের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে বসবাস করতেন। এর মাঝে কিছু গোত্র হয়তো লোহিত সাগর ধরে দক্ষিণ দিকে সরে এসেছে। আরবের অধিবাসীরা যে উত্তর দিক থেকে এসেছে, তার স্বপক্ষে ধর্মতাত্ত্বিক সমর্থন পাওয়া যায় এখান থেকে। আর ইবরাহীম ﷺ সম্পর্কে ইসলামি উৎসগুলোতে বলা হয়েছে, তিনি নিজের দ্বিতীয় স্ত্রী ও তাঁর গর্ভজাত পুত্র ইসমাঈলকে মক্কা উপত্যকায় নিয়ে এসেছিলেন। তাই এ থেকে আরও ধারণা করা যায়, কিছু আরব গোত্র ইসমাঈল ﷺ-এর বংশধর। আর ইসমাঈল ও তাঁর মা-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া পানির উৎস দেখে যেসব বেদুইনরা এসে জড়ো হয়েছে, তারা এসেছে অন্য কোনো জায়গা থেকে। তবে নৃবিজ্ঞানী ও ধর্মবেত্তারা সব বিষয়ে পুরোপুরি একমত হননি।

সামাজিক সংগঠন এবং বসতির ধরন

আরবের অধিবাসীদের সমাজ-প্রকৃতিকে দুটি অসম শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—যাযাবর ও নাগরিক। একটু পরই আমরা দেখব দক্ষিণ আরবে কিভাবে কিছু সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছাড়া বাকি সব স্থায়ী জনবসতি গড়ে উঠেছিল প্রধানত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরবের মরুদ্যানগুলো কেন্দ্র করে। সেইসাথে উন্নত দক্ষিণ ও উর্বর উত্তরের মধ্যকার বাণিজ্যিক সড়ক ঘিরে গড়ে ওঠা প্রধান শহরগুলোতে। প্রথম ধরনের স্থায়ী জনবসতিগুলো কৃষিকেন্দ্রিক, যেমন ইয়াসরিব (মদীনা) এবং নাজরান। আর দ্বিতীয় ধরনের বসতিগুলো বাণিজ্যের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে মক্কা, পেত্রা এবং পালমিরা। ইসলাম আবির্ভাবের স্থান মক্কার কৌশলগত

গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে ধর্মীয় কারণে। সেই তখন থেকে নিয়ে আজও পর্যন্ত এটি হাজিদের চূড়ান্ত গন্তব্য। এটি মক্কাকে আরব শহরগুলোর মাঝে এক বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে। এই মর্যাদার কারণে এর নাম হয়েছে 'উম্মুল কুরা'—সব শহরের জননী। এই জনবসতিগুলোর অস্তিত্ব সত্ত্বেও আরবের প্রধান জীবনপদ্ধতি ছিল যাযাবরীয়। যাযাবর ও নাগরিক জনবসতির মাঝে পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম যদিও। আধা-যাযাবর ও আধা-নাগরিক কিছু ধরন রয়েছে। সাবেক বেদুইনদের অনেকে তাদের যাযাবর জীবনকে পেছনে ফেলে ক্রমশ নাগরিক হয়ে ওঠে। আবার কিছু বেদুইন তখনো পুরোপুরি নগরবাসী হয়ে ওঠেনি (Hitti, 1963)। এমনকি এও বলা হয় যে, নগরবাসীরাও আদতে বেদুইনই ছিল। উন্নততর জীবনের খোঁজ করতে করতে তারা মরুদ্যানগুলোর দখল নিয়ে নেয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আগে থেকে দখল হয়ে থাকা মরুদ্যানে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে এসে ঢুকে পড়ে (শহীদ, ১৯৭০)।

বেদুইনদের বৈশিষ্ট্য

অতএব, আরব অধিবাসীদের প্রধান সামাজিক বৈশিষ্ট্য ছিল বেদুইন সংস্কৃতি। এটা তাদের চিন্তাকে আকৃতি দান করে ও জীবনপদ্ধতি নির্ধারণ করে। বেদুইনদের জীবন, ব্যক্তিত্ব ও অর্থনৈতিক আচরণকে কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে চেনা যায়—সহ্যক্ষমতা, ব্যক্তিস্বার্থ, গোত্রপ্রীতি, আতিথেয়তা, বীরত্ব এবং সংঘাতের প্রতি আগ্রহ।

❑ সহ্যক্ষমতা :

মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাবের স্পষ্টতম উদাহরণ হলো সহ্যক্ষমতা। শুষ্ক ভূমি হিসেবে আরবের দেওয়ার মতো তেমন কিছুই ছিল না। এমন প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য বেদুইনদেরকে সেই ভূমির কঠিন পরিস্থিতির সাথে মানসিক ও শারীরিকভাবে মানিয়ে নেওয়া শিখতে হতো। মানসিকভাবে তাদের ধৈর্যশীল হওয়া দরকার ছিল। কারণ তারা রুক্ষ ভূমির মৌলিক চরিত্র পরিবর্তন করতে একেবারেই অক্ষম। বেদুইনরা শিখে নেয় যে, মানসিক সহনশীলতা বা 'ধৈর্য' হলো টিকে থাকার প্রথম উপাদান। আর শারীরিক ধৈর্য হিসেবে তাদের শিখতে হতো কিভাবে মরুজীবনের দুর্বিষহতা সহ্য করতে হয়। তাদের খাদ্য ছিল নগণ্য, প্রধানত খেজুর এবং আটা ও দুধ বা পানির মিশ্রণ। আর পোশাক ছিল খাবারের মতোই অপ্রতুল।

বেদুইনদের কাছে সহ্যক্ষমতা ছিল মহত্তম গুণ। এমন এক গুণ, গোত্রের ও এর সদস্যদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আরব কাব্যমালায় যা সগর্বে গাওয়া হয়েছে। মুসলিমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবেও কুরআনে বারবার জোর দেওয়া হয়েছে এর ওপর। ইসলামি

রাষ্ট্রের প্রসারের সময় শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এই চরম সহ্যক্ষমতা এক মহাগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সহ্যের মানদণ্ড উঁচু হওয়ার কারণে বাহিনীগুলো এমন সৈন্য দিয়ে গড়া ছিল, যারা অন্যান্য সেনাবাহিনীর তুলনায় স্বল্পতর খাবারের ওপর টিকে থাকতে পারত। বাইজেন্টাইন ও পারস্য সেনাবাহিনীর তুলনায় সরঞ্জামাদি কম থাকায় ইসলামি সেনাবাহিনীর চলাচলের গতি ছিল দ্রুততর। (এর এক অসাধারণ উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যায় ইসলামি রাষ্ট্রের প্রাথমিক কালের সম্প্রসারণের ইতিহাসকে। ইসলামি সেনাদল তখন বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য দক্ষিণ ইরাক থেকে সিরিয়ার দক্ষিণদিক পর্যন্ত অতিক্রম করে ফেলে খুবই অপ্রত্যাশিত গতিতে।) ভোক্তার আচরণ-সম্পর্কিত ইসলামি বিধিমালায় অর্থনৈতিক সম্পদের স্বল্পতা ও সীমিত সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের ওপর। ভোগের ক্ষেত্রে না-অপচয়, না-কৃপণতা নীতির আদেশ দেওয়া হয়েছে কুরআনে (সূরা আরাফ, ৭: ৩১, সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭: ২৯)। যথাস্থানে এ নিয়ে আলোচনা আসবে।

❑ ব্যক্তিস্বার্থ :

এটি ছিল বেদুইন চরিত্রের আরেকটি স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিস্বার্থের ছিল দুটি দিক: নিজের প্রতি আস্থা এবং গোত্রের প্রতি বিশ্বস্ততা। এই দুই স্তরের বাইরে অন্যের বিষয়-আশয় নিয়ে ব্যক্তি মাথা ঘামাবে না। এই বৈশিষ্ট্যটিও পরিবেশের প্রভাবের একটি প্রতিফলন। মরুভূমি জিনিসটাই প্রশস্ত ও খোলামেলা, যা বেদুইনকে স্বাধীনচেতা ও মুক্তির অনুভূতি এনে দেয়। যদি অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর কারণে কোনো ভূমিতে অবস্থান করা কঠিন হয়ে যেত, তাহলে অন্যত্র সরে যেত তারা। তা ছাড়া মরুজীবনের কাঠিন্য হয় ব্যক্তিস্বার্থকে আরও দৃঢ় করে তোলে, অথবা ব্যক্তিস্বার্থের জন্ম দেয়। প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার নীতি এভাবেই প্রাধান্যের ক্রম নির্ধারণ করে দিত: আগে নিজেকে প্রাধান্য দিতে হবে, তারপর অন্যদের। হিট্টির ভাষ্যমতে, বেদুইনরা কখনোই নিজেদেরকে আন্তর্জাতিক ধাঁচের সামাজিক জীবের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেনি। গোত্রীয় সীমানার বাইরে সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শের প্রতি কোনো আগ্রহ বিকশিত হয়নি তাদের মাঝে (Hitti, 1963)।

ইসলাম সামাজিক সহযোগিতার শিক্ষা দেয়। কিন্তু বেদুইন-চরিত্রে ব্যক্তিস্বার্থ এতই গভীরে প্রোথিত যে, ইসলাম আগমনের পরেও এক বেদুইন এরকম দুআ করেছিল বলে বর্ণিত আছে, 'হে রব! শুধু আমাকে আর মুহাম্মাদকে রহম করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি রাষ্ট্রের জন্ম : কুরআন–সুন্নাহর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

(৬১০ - ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)

ভূমিকা

ছয়শ দশ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য আরব এক নাটকীয় পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে চলে আসে। এটা শুধু তার একার ইতিহাস নয়। বরং আসন্ন শতাব্দীগুলোর বহু জাতির ইতিহাসের মোড়ও ঘুরিয়ে দেয়। এই সময়ে মক্কা প্রথমবারের মতো শুনতে পায় যে, নবি মুহাম্মাদ ﷺ (৫৭১–৬৩২) একটি নতুন ধর্ম প্রচার করছেন। তিনি নিজে সেটার বার্তাবাহক।

নতুন এই ধর্মটির নাম ইসলাম। এর অর্থ অদ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রভুর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তাঁর ঐশী ক্ষমতার কাছে পুরোপুরি আত্মনিবেদন। ইসলামের উপাস্য অদ্বিতীয় সত্য আল্লাহ, যিনি নবি ইবরাহীম ﷺ-এর প্রভু। ইসলামের একজন বিশ্বাসীকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়—'এক আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর প্রেরিত গ্রন্থসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, বিচার-দিবসের প্রতি এবং তাকদিরের ভালো ও মন্দের প্রতি।' (সহীহ মুসলিম: ১) একক সর্বোচ্চ উপাস্যের আরবি শব্দ আল্লাহ। ইবরাহীম ﷺ-এর প্রভুর থেকে তিনি আলাদা কোনো সত্তা নন, বরং একই উপাস্য। এমন না যে তিনি উপাস্যের একটি ইসলামি সংস্করণ। বরং একেশ্বরবাদী ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের উপাসিত সত্তাই হলেন আল্লাহ। ইসলাম এ কারণেই (অবিকৃত) ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মকে আসমানি ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পূর্ববর্তী নবি ও রাসূলগণের রয়েছে বিরাট মর্যাদা। কিন্তু ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মের সাথে ইসলামের অনেক পার্থক্যের মাঝে একটি হলো, ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা নয়। তাই এটি একইসাথে একটি ধর্ম ও একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তা ছাড়া ইসলাম জোর দিয়ে বলেছে, 'বলো, তিনিই আল্লাহ, একক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী; তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও

জন্ম দেওয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই' (সূরা ইখলাস, ১১২: ১–৪)।

বিগত দুটি একেশ্বরবাদী ধর্ম ইহুদি ও খ্রিষ্টবাদের মতো ইসলামকেও প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আরবের বেদুইনরা কঠোরভাবে তাদের অতীত ধর্ম ও ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রাখে। আগের অধ্যায়ে এটি আলোচিত হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানাবে, এমন কোনো ধ্যানধারণাকেই তাদের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। অন্তত প্রচণ্ড প্রতিরোধ ছাড়া তো নেবেই না। তার ওপর প্রতিরোধের আরেকটি কারণ নতুন ধর্মটির রাজনৈতিক ভূমিকা। ইসলাম শুধু ধর্মীয়ভাবেই নয়; বরং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবেও ঘোরতর পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। তাই তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার ভিত্তি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বসে ধর্মটি। তাই সমাজের উঁচু শ্রেণি প্রবলভাবে এর বিরোধিতা করে, বিশেষত স্বয়ং মক্কায়।

ইসলাম সহযোগিতা খুঁজে পায় মদীনার নাগরিক জনসমাজে। মদীনাবাসীরা ইসলামকে সহযোগিতা করার পেছনে দুটি প্রধান অনুঘটক চিহ্নিত করা যায়;

➡ আরব পৌত্তলিকদের সাথে মদীনার ইহুদিদের দ্বন্দ্ব এবং

➡ শহরটির প্রধান দুই গোত্রের মাঝে অবিরত সংঘর্ষ।

প্রথমত, ইহুদিরা মূর্তিপূজারি মদীনাবাসীদের ঘৃণা করত। গর্ব করত নিজেদের আসমানি ধর্ম ও প্রতীক্ষিত মাসীর আবির্ভাবের ব্যাপারে। মদীনাবাসী আরবরা ইসলামের মাঝে ইহুদিবাদের যথার্থ বিকল্প খুঁজে পায়। তারা আশা করে যে, আল্লাহর বাণী বলতে থাকা এই ব্যক্তিই হতে পারেন বহুলালোচিত সেই প্রতীক্ষিত নবি। দ্বিতীয়ত, প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র দুটি আশা করে যে নতুন নবি তাদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

মক্কায় দশ বছরে সীমিত সাফল্য লাভের পর নবি ﷺ ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে মদীনায় হিজরত করেন। কিছু সাহাবিকে তাঁর আগেই স্থানান্তরিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মদীনার কেন্দ্র থেকে নবি ﷺ বাকি আরবে অভিযান পরিচালনা করেন। মক্কার অবিশ্বাসীদের সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর অবশেষে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে তাদের পরাজিত করে মক্কা অধিকার করেন তিনি। ৬৩১ সালে নবি ﷺ এবং তাবুকের ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মাঝে গাসসান ভূমির সীমান্তে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কোনো সামরিক সংঘাত ছাড়াই 'জিযিয়া' নামক কর পরিশোধের শর্তে তারা ইসলামের নিরাপত্তার অধীন হতে সম্মত হয়ে যায় (ইবনু হিশাম)। (প্রাপ্তবয়স্ক অমুসলিম পুরুষদের ওপর আরোপিত এই কর যাকাতের বিকল্প। যাকাত শুধু মুসলিমরা প্রদান করে।) তা ছাড়া ৬৩০–৬৩১ সালের মধ্যে আরবের অন্যান্য অংশ এবং মিশরে

প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয় জনগণকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য। মধ্য আরব, ওমান, হাদরামাউত, ইয়েমেন, হামাদান ও কিন্দার অনেক গোত্র ইসলামের ছায়াতলে যোগদান করে। হিট্টির ভাষ্যমতে যে আরব এত দিন কোনো একক ব্যক্তির কর্তৃত্ব মেনে নেয়নি, সেই আরব নবি মুহাম্মাদ ﷺ এর শাসনকর্তৃত্ব মেনে নিতে এবং নতুন এই ব্যবস্থায় যোগদানে আগ্রহী হয়ে ওঠে, (Hitti, 1963)। অবশেষে ঐক্যবদ্ধ হয় আরব। ইতিহাসে এটি ইসলামি-আরব রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন হিসেবে সুপরিচিত।

রাষ্ট্রের প্রশাসনিক মূলনীতি নির্ধারণ করেন নবিজি ﷺ। মক্কা বিজয়ের পরও তিনি অবস্থান করছিলেন মদীনায়। এটিই হয় ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী (ইবনু হিশাম)। নবি ﷺ হন রাষ্ট্রপ্রধান। মদীনায় থেকে হিজরত করা সাহাবিগণ তাঁর সহযোগী হন। নবিজি ﷺ সর্বদা জনগণের হাতের নাগালে থাকতেন। যাপন করতেন সাদামাটা এক জীবন। প্রায়শই তাঁকে নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতে দেখা যেত। স্থানীয় পর্যায়ে নবি মুহাম্মাদ ﷺ একজন করে নেতা বা ইমাম নিযুক্ত করে দিতেন, যিনি প্রত্যেক প্রদেশের ধর্মীয় উপনেতা ও প্রধান কার্যনির্বাহীর দায়িত্ব পালন করবেন। সেইসঙ্গে পাঠানো হয় কুরআনের শিক্ষকদের, যারা জনগণকে কুরআন ও ধর্মের বিস্তারিত শিক্ষা দেবেন।

ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তার উৎসসমূহ

ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তার বিবর্তন ঘটে ইসলামি আইন তথা শরীয়ত বিকাশের সাথে সাথে। এই আইনের ভেতর মুসলিমদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়মকানুন অন্তর্ভুক্ত। এটি জীবনযাপনের একটি বিধান। তাই শরীয়ত এবং এর উৎসগুলোর বিকাশ আলাদা করে আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে। এরপর অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর আলোচনা আসবে।

নবিজি ﷺ-এর জীবনকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ধরে ইসলামি আইন বা শরীয়তকে দুটি প্রধান উৎসে বিভক্ত করা যায়:

- এক. জীবদ্দশায় স্বয়ং নবি ﷺ যা কিছু প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছেন;
- দুই. সেগুলো থেকে তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিমরা যা আহরণ করেছেন।

প্রথম উৎসের মাঝে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ, আর দ্বিতীয়টি হলো ফিকহ শাস্ত্র।

❑ আল-কুরআন

কুরআন হলো আল্লাহর বাণী। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে মহান ফেরেশতা জিবরীল

ﷺ এটি নিয়ে এসেছেন। তেইশ বছর ধরে এটি অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। এভাবে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসেবে তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা যায়:

➡ প্রথমত, প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা যেন এটি অধ্যয়নের সুযোগ পায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন: 'আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে, যাতে তুমি বিরতি দিয়ে তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পারো। আর আমি তা ধাপে ধাপে অবতীর্ণ করেছি', (সূরা ইসরা, ১৭: ১০৬)।

➡ দ্বিতীয়ত, মানুষের কিছু অভ্যাসকে ধাপে ধাপে পরিবর্তন করানো হয়েছে কিছু আয়াতের মাধ্যমে। কোনো ব্যক্তির ভোগের অভ্যাসকে পরিবর্তন করতে যে সময় লাগতে পারে, সেটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এখানে। অপছন্দনীয় অভ্যাস ধাপে ধাপে ছাড়ার জন্য মানুষকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে (Al-Khun, 1984)। বিষয়টিকে দেখতে হবে তৎকালীন জীবনপ্রকৃতির আলোকে। অবাধ যৌনাচার, জুয়া ও মদপান সেখানে ভোক্তার অগ্রাধিকার তালিকায় বেশ ওপরের দিকে ছিল।

➡ তৃতীয়ত, সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামো-সংক্রান্ত আয়াতগুলো সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে ইসলামি জনসমাজ সেই পরিবর্তনগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে পেরেছে। তাই বিরতি দিয়ে দিয়ে আয়াত অবতীর্ণ করাটাই ছিল যৌক্তিক।

মুসলিমরা কুরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একেবারে নিঃসন্দেহ। নবি ﷺ-এর নিয়োগকৃত একটি দল কুরআন নাযিলের সময়েই এর পাঠ লিখে রাখতেন। নবিজি ﷺ এর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পাঠকে আয়াতে বিভক্ত করা হয়েছে, সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, এবং ক্রমানুসারে সাজিয়ে অধ্যায়ে (সূরা) বিভক্ত করা হয়েছে (Al-Qattan, 1992)।[১] নবিজির মৃত্যুর দুই বছর পর প্রথম খলিফা আবু বকর ﷺ কুরআনের পাণ্ডুলিপি সংকলন ও একে একটিমাত্র খণ্ডে সংরক্ষণ করার আদেশ জারি করেন। কুরআন সংকলনের কাজে দ্বৈত-যাচাই পদ্ধতি অবলম্বন করেন আবু বকর ﷺ। লিখিত পাণ্ডুলিপিকে হাফিয ও সাহাবিদের মুখস্থ করা পাঠের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। ৬৪৪–৬৫৬ সালের মধ্যে তৃতীয় খলিফা উসমান ﷺ মূল পাণ্ডুলিপির কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করার আদেশ দেন। এর বাইরে অন্য যত পাণ্ডুলিপি আছে, সেগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। সেই অনুলিপিই আজ পর্যন্ত মুসলিমরা ব্যবহার করে আসছে

[১] কুরআনের সূরাসমূহের নাম, আয়াত ও সূরাগুলোর ক্রমবিন্যাস ইত্যাদি স্বয়ং ওহির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। জিবরীল ﷺ ওহি নিয়ে আগমণের পর এগুলো জানিয়ে দিতেন। নবি ﷺ সেই অনুসারে ওহি লেখকদের নির্দেশ দিয়ে রাখতেন। - সম্পাদক

(প্রাগুক্ত)।

❑ সুন্নাহ

নবি ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় যা বলেছেন, করেছেন ও করতে সম্মতি দিয়েছেন, সেগুলোর বর্ণনাই সুন্নাহ। শরীয়তের উৎস হিসেবে তাই সুন্নাহ তিনটি প্রধান উপাদানে বিভক্ত: নবিজির কথা, তাঁর কর্ম এবং অন্যদের কাজের প্রতি তাঁর সমর্থন। নবিজির কথা যদিও আল্লাহর কালাম নয়, কিন্তু আল্লাহর আদেশেই তিনি এগুলো বলেছেন। মানুষ থেকে মানুষে সরাসরি শিক্ষাদানের মাধ্যমে তিনি কুরআনের বিধিবিধান ব্যাখ্যা করেছেন। কুরআনের আয়াতে যা সাধারণভাবে উল্লেখিত হয়েছে, তিনি সেগুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন বিস্তারিতভাবে। কুরআন লিখে রাখার জন্য তিনি অনুসারীদের আদেশ তো করেছেন বটেই, একটি বিশেষ দলকে নিয়োগও করেছিলেন এই কাজ সম্পাদন করার জন্য। কিন্তু কুরআনের পাঠ্যের সাথে যেন নবিজির কথা মিশ্রিত না হয়ে যায়, এজন্য তিনি নিজের কথাগুলো না লিখার আদেশ দেন। কেউ তা লিখে থাকলে মুছে ফেলতে বলেন এবং সেগুলো শুধু মৌখিকভাবে প্রচার করতে বলেন (Khallaf, 1942)।[১] ঐশী বাণী কুরআন এবং নবি ﷺ-এর কথা ও কাজ হাদীস তাই মুসলিমদের কাছে ভিন্ন।

লিখিতভাবে হাদীস সংকলনের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয় উমাইয়্যা খলিফা উমর বিন আবদুল আযীয রহ.-এর শাসনামলে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। সংকলনের তিনটি কারণ রয়েছে:

(ক) হাদীসের বহু আলিম ও হাফিযের মৃত্যু,

(খ) ইসলামি রাষ্ট্র সম্প্রসারণের ফলে হাদীস মুখস্থকারীদের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়া, যার ফলে হাদীস যাচাইয়ের জন্য তাদের সাথে আলোচনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে, এবং

(গ) নতুন ধর্মান্তরিত মুসলিম এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের নিজেদের ফায়দা হাসিলের জন্য হাদীস অপব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা (Khallaf, 1942)।

নিষ্ঠাবান মুসলিমরা তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাদীসের হাফিযদের কাছে

---

[১] রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায়ও হাদীসের কিছু সংকলন হয়েছিল। কুরআনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ, কুরআনের বর্ণনাভঙ্গির সাথে মুসলিমদের যথাযথভাবে পরিচিত হওয়া-সহ নানাবিধ কারণে প্রথমদিকে সাময়িকভাবে হাদীসের সংকলনকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে অনেকেই নবিজির আদেশে বা অনুমতিক্রমে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত জানতে পড়ুন: হাদীসের প্রামাণ্যতা, আল্লামা মুফতি তাকি উসমানী। - সম্পাদক

গিয়ে গিয়ে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু করেন। হাদীসের শুদ্ধতা নিশ্চিত করতে সংকলকগণ ইসনাদ (সনদ) নামক একটি পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে রয়েছে বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ-সহ একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র। সর্বশেষ যিনি বর্ণনা করেছেন, তার নাম থেকে এই সূত্র শুরু। আর যিনি স্বয়ং নবিজির ﷺ কাছ থেকে শুনেছেন বা করতে দেখেছেন বা তাঁর সম্মতি পেয়েছেন, সেই সাহাবির নাম থাকে সূত্রের শেষে। আধুনিক গবেষকরা যেভাবে তাদের আগের কাজ বা গবেষণাকর্মের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন, সেটা এই ইসনাদ পদ্ধতিরই অনুরূপ। হাদীসের শুদ্ধতার প্রশ্নে সচেতন থাকার ফলে সংকলকগণ হাদীস যাচাই ও তুলনা করে দেখতেন। সাংঘর্ষিক বর্ণনা বাদ দিয়ে দেন এবং নির্ভরযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে একটি শ্রেণিবিন্যাস করেন। হাদীসের বিশুদ্ধতার গুরুত্ব প্রসঙ্গে মধ্যযুগের একজন মুজতাহিদ ইমাম আবু ইউসুফ ﵀ বলেছেন যে, কোনো সুন্নাহকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হলে সেটিকে অবশ্যই:

➡ ১. কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে,

➡ ২. এমনভাবে প্রাপ্ত হতে হবে, যাতে এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ না থাকে,

➡ ৩. জনসমাজে পরিচিত[১] ও সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে,

➡ ৪. ফকিহগণের মাধ্যমে বর্ণিত এবং তাদের কাছে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে,

➡ ৫. এমন ব্যক্তিগণের মাধ্যমে বর্ণিত হতে হবে, যারা তাদের সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য সুপরিচিত,

➡ ৬. ইসলামি শিক্ষার সার্বিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে,

➡ ৭. নবি ﷺ এর আচার-আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে (Ansari, 1979)।[২]

সংকলকদের নামানুসারে সবচেয়ে বিখ্যাত ছয়টি হাদীস সংকলন গ্রন্থ হলো:

---

[১] এখানে ইমাম আবু ইউসুফ ﵀-এর উদ্দেশ্য হলো, হাদীসটি সালাফের যুগে সাধারণভাবে আহলে ইলমের নিকট পরিচিত হওয়া। - সম্পাদক

[২] ইমাম আবু ইউসুফ ﵀ আর-রাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযাঈ গ্রন্থে (পৃ. ৩১) উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত শর্তগুলো ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং এগুলোর প্রয়োগ একান্তই মুজতাহিদ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের কাজ। গ্রন্থকার মুহাদ্দিসগণের হাদীস গ্রহণে সতর্কতার উদাহরণস্বরূপ এখানে তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এগুলো হাদীস গ্রহণ বা যাচাইয়ের শর্ত, কিন্তু হাদীস প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর এগুলোর অজুহাতে হাদীস অস্বীকারের সুযোগ নেই। - সম্পাদক

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইসলামি অর্থনীতির কাঠামো সম্পর্কে জানার পর এবার আমরা মনোনিবেশ করব পরবর্তী অধ্যায়ে। এখানে এমন একটি যুগে ইসলামি অর্থনীতির বিকাশ নিয়ে আলোচনা হবে, যা নবি ﷺ-এর যুগের থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত: খিলাফতে রাশিদা।

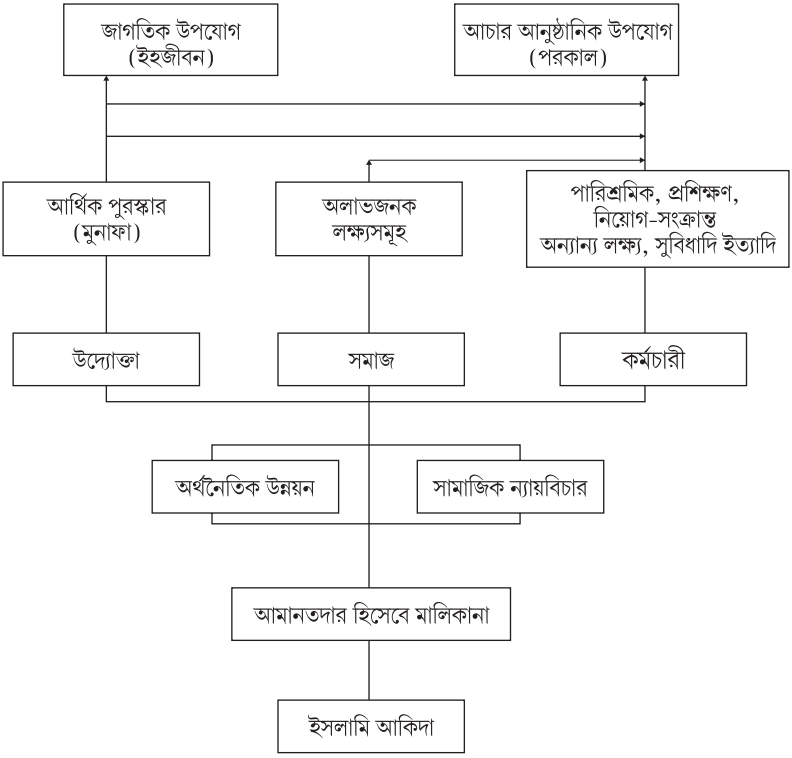

চিত্র ২.১: ইসলামি উদ্যোক্তার লক্ষ্য (*El-Ashker, 1987*)

তৃতীয় অধ্যায়

খুলাফায়ে রাশিদীনের অর্থনৈতিক দর্শন

(৬৩২ খ্রি.-৬৬১ খ্রি.)

ভূমিকা

সুপথপ্রাপ্ত খিলাফত, খিলাফতে রাশিদা বলতে এমন একটি যুগকে বোঝায়, যার পরিচিতিমূলক চিহ্ন হলো ধর্মানুরাগ এবং কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার যথাযথ প্রয়োগ। এই যুগের পর উমাইয়্যা শাসনামল থেকে এসকল ঐশী শিক্ষা ও ইসলামি আদর্শের প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্য ক্রমেই শিথিল হতে শুরু করে। রাশিদাহ যুগের ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ। একদিকে আছে নবি ﷺ-এর মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরই বিপুল পরিমাণে ধর্মত্যাগের ঘটনা, দুজন বিশেষ মর্যাদাবান সাহাবির রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকালীন আততায়ীর হাতে নিহত হওয়া, একজন এক মুসলিমের হাতে ও অপরজন এক অমুসলিমের হাতে, তৃতীয় আরেক সাহাবি একদল মুসলিম বিদ্রোহীর হাতে খুন হওয়া, মুসলিম উম্মতের মাঝে বড় আকারের বিভেদ, যা আল-ফিতনাতুল কুবরা নামে পরিচিতি। আরেকদিকে রয়েছে এত বিশাল পরিসরে সামরিক বিজয়, যা ইতিহাসে অভূতপূর্ব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং তৎকালীন বৃহত্তম দুটি সভ্যতার ওপর সামাজিক কর্তৃত্ব। তাই এই যুগটি যথার্থই বিশেষ গবেষণার দাবি রাখে। ধর্মশাস্ত্রীয় দিক বিচারে, ইসলামি আইনশাস্ত্র তথা ফিকহ-এর একটি সুসংলগ্ন কাঠামোর প্রথম সাক্ষী এই যুগটিই। পরবর্তী শতাব্দীগুলোকেও এটি প্রভাবিত করতে থাকে। বিচারিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য চিন্তা থেকে শুরু করে প্রথিতযশা চারটি মাযহাবের চিন্তাপদ্ধতির ওপর এর রয়েছে বিশাল অবদান। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তায় এসকল ঘটনার প্রভাব এবং প্রাসঙ্গিকতা। এ ছাড়াও আলোচিত হবে পরবর্তী ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তার সুসংহত গঠনের পেছনে সুপথপ্রাপ্ত খলিফাগণের অবদান।

অর্থনৈতিক ফিকহ প্রথমবারের মতো দেখা যায় খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে। নবি ﷺ-এর যুগে যেসব জরুরি আর্থ-সামাজিক সমস্যার অস্তিত্ব ছিল না বা থাকলেও

ছোট পরিসরে ছিল, সেগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়েই এর প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব (Khallaf, 1942)। বোঝাই যায় যে, এর উত্তর ছিল ইসলামি সংবিধান তথা শরীয়তের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা। কুরআনি আদেশমালা ও সুন্নাহর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি আসা যাবে না। ওহির আগমন সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া এবং নবি ﷺ-এর মৃত্যুর পর যখন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন দেখা দেয়, তখন এই লক্ষ্যে অটুট থাকাটা কঠিন বটে। কিন্তু খলিফাগণ কার্যত সে-সময়কার অর্থনীতিবিদ ও আইনবিদ। তাঁরা সেই দায়িত্ব পালন করে দিয়ে গেছেন। উম্মতকে দিয়ে গেছেন কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে নিজস্ব বিচারে সিদ্ধান্ত বের করতে পারার অতি-প্রয়োজনীয় জ্ঞান। এর মাঝে রয়েছে বিভিন্ন মাত্রার জটিলতাসম্পন্ন বৈচিত্র্যময় সব পরিস্থিতি।

খিলাফত

সময়টা ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ। মুসলিমদের জীবনে তখন চলে আসে সবচেয়ে নাটকীয় পরিবর্তন—নবি ﷺ-এর মৃত্যু। অবশ্য নবি মুহাম্মাদের মৃত্যু শুধু অবশ্যম্ভাবীই না, প্রত্যাশিতও ছিল। কারণ কুরআন মুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, তিনি একজন মানুষ ও রাসূল মাত্র। তাঁর আগে আরও অনেক রাসূল গত হয়েছেন। সতর্ক করে দিয়েছে যে, তাঁর মৃত্যুর পর ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেই পারে। (সূরা নিসা, ৩: ১৪৪)। তারপরও মুসলিমরা মারাত্মকভাবে ধাক্কা খান এ ঘটনার পর। এক ঘনিষ্ঠ সাহাবি ও পরবর্তীকালে দ্বিতীয় খলিফা উমর ﷺ কিছু সময়ের জন্য ধরে নিয়েছিলেন যে, নবিজি এখন মৃত্যুবরণ করতে পারেন না। অল্প কিছু সময়ের জন্য নবি ﷺ মারা যাওয়ার 'গুজব' প্রচারের দুঃসাহস যারা দেখাবে, তাদেরকে হুমকিও দিয়ে বসেন তিনি (আত-তাবারি)। তখন সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাহাবি ও নবিজির শ্বশুর আবু বকর ﷺ ঘোষণা দেন যে, নবিজি সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন। কুরআনের ওই আয়াতটি তিনি শুনিয়ে দেন এবং ঘোষণা করেন: 'যারা মুহাম্মাদের উপাসনা করত, তারা জেনে রাখুক মুহাম্মাদ ﷺ মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহর উপাসনা করে, তারা জেনে রাখুক আল্লাহ চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী।' (সহীহ বুখারি: ৪৪৫২) উমর ﷺ পরে বলেছিলেন যে, সেদিন আবু বকরের মুখে উক্ত আয়াতটি শুনে তাঁর কাছে মনে হয়েছিল যেন প্রথমবারের মতো সেটি শুনছেন। (প্রাগুক্ত) ঘটনাটির ধাক্কাটা প্রবল বটে, কিন্তু তার সাথে রয়েছে চিরন্তন এক আশা।

নবিজির মৃত্যু এক অনিবার্য সমস্যার জন্ম দেয়, আসন্ন শতাব্দীগুলোতেও মুসলিমরা যার মুখোমুখি হতে থাকবে—খিলাফত, তথা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নবি ﷺ-এর প্রতিনিধি কে হবে? আল্লাহর বার্তাবাহক হিসেবে নবিজির জায়গায় আর

কেউ বসতে পারবে না, সেটা সর্বজনবিদিত। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকায় কেউ-না-কেউ তো তাঁর উত্তরসূরি হবে। আর সেটা সবসময় সর্বসম্মতিক্রমে হয়নি। নবিজির মৃত্যুর দিনটি থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত খিলাফতকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে আছে। এমনকি কামালপন্থি তুর্কিরা ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে সর্বশেষ উসমানী খলিফা দ্বিতীয় আবদুল মাজিদকে অপসৃত করে খিলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দেওয়ার পরও এ বাস্তবতার ব্যত্যয় ঘটেনি (Hitti, 1963)। নবিজি যেদিন মারা যান, খিলাফত-সংক্রান্ত বিতর্ক স্পষ্টতই সেদিন থেকেই শুরু হয়। নবি ﷺ-এর দেহ মুবারাক দাফন করার আগে খিলাফতের অধিকার নিয়ে কিছু কথাবার্তা হয় মুসলিমদের দুটি দল—মদীনার আনসার এবং মক্কার মুহাজিরগণের মাঝে। যার সমাপ্তি ঘটে নবিজির ঘনিষ্ঠতম সহচর আবু বকর ﷺ-এর কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে। মুহাজির কুরাইশ আবু বকর ﷺ হন প্রথম উত্তরসূরি বা খলিফা। এরপর গিয়ে মুসলিমরা নবিজির দেহ দাফন করার মতো ফুরসত লাভ করে।

চৌদ্দশ বছরের বেশি সময় ধরে যত খিলাফত এসেছে ও গিয়েছে, সবগুলোর মাঝে খিলাফতে রাশিদা মুসলিম-মানসে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার অধিকারী। আল-খিলাফাতুর রাশিদা অর্থই সঠিক পথপ্রাপ্ত খিলাফত। মুসলিমদের দৃষ্টিতে ধর্মানুরাগ ও উচ্চ আত্মিক মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত একমাত্র খিলাফতব্যবস্থা এটিই। খিলাফতে রাশিদার স্থায়িত্ব ৬৩২ থেকে ৬৬১ সাল পর্যন্ত এবং এর ভেতর রয়েছেন চারজন সুপথপ্রাপ্ত খলিফা—আবু বকর (৬৩২–৩৪), উমর (৬৩৪–৪৪), উসমান (৬৪৪–৫৬) এবং আলি (৬৫৬–৬১) ﷺ। চারজনই নবিজির ঘনিষ্ঠ সাহাবি এবং সর্বশেষজন অর্থাৎ আলি ﷺ তাঁর আপন চাচাত ভাইও। এদের সকলেই আবার বৈবাহিক সূত্রে নবিজির আত্মীয়। আবু বকর ও উমর নবিজির শ্বশুর এবং উসমান ও আলি তাঁর জামাতা। একমাত্র আবু বকর ﷺ ছাড়া বাদবাকি সকলে নির্মমভাবে শহীদ হন। উমর ও আলি ﷺ নামাজ পড়া অবস্থায় আততায়ীর হাতে শহীদ হন এবং উসমান ﷺ-কে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় হত্যা করা হয়। সকল খলিফাই ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন, যদিও পর্যায় ও মাত্রায় ভিন্নতা রয়েছে।

সুপথপ্রাপ্ত খিলাফতের যুগ ইসলামের ইতিহাসের এক গুরুত্ববহ সময়কাল। এ সময়ে ঘটেছে

- (ক) নবি ﷺ-এর মৃত্যুর ফলে মনস্তাত্ত্বিক ধাক্কা,
- (খ) গোত্রীয় বিদ্রোহ, যেটিকে সামরিকভাবে পরাজিত করতে হয়েছে,

➡ (গ) ইসলামের দ্বিগ্‌বিজয়, যা পূর্ব দিকে খুরাসান, উত্তরে জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া, পশ্চিমে মিশর ও উত্তর আফ্রিকার উপকূল, এবং দক্ষিণে ইয়েমেন ও হাদরামাউত পর্যন্ত পৌঁছে যায়,

➡ (ঘ) ইসলামি সমাজে অভূতপূর্ব দ্রুত ও নাটকীয় পরিবর্তন, এবং যুগটির শেষের দিকে

➡ (ঙ) রক্তপাত পর্যন্ত গড়ানো অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

মোটকথা, বিশাল ইসলামি রাজ্যের সম্প্রসারণ থেকে শুরু করে গভীর বিভেদ পর্যন্ত হরেক রকম ঘটনার সমন্বয় ঘটেছে এই যুগে। আমাদের আলোচ্য হলো ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশে সেসব ঘটনার প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা এবং ইসলামি অর্থনৈতিক ধ্যানধারণার বিকাশে সুপথপ্রাপ্ত খলিফাগণের অবদান। ফিকহের ভেতর অর্থনৈতিক বিষয়-আশয়ও অন্তর্ভুক্ত। আগেই বলা হয়েছে যে, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগেই এর প্রথম উদ্ভব ঘটে। নবি ﷺ-এর জীবদ্দশায় দেখা দেয়নি বা দিলেও একই মাত্রায় না, এরকম নতুন আর্থ-সামাজিক সমস্যার উত্তর খোঁজার লক্ষ্যেই এর জন্ম। অর্থনৈতিক ফিকহের বিকাশে বিভিন্ন খলিফা কয়েক উপায়ে ও বৈচিত্র্যময় মাত্রায় অবদান রেখেছেন, যা নিচে দেখানো হয়েছে।

প্রথম খলিফা আবু বকর ﵁ (৬৩২–৬৩৪)

খলিফা আবু বকর ﵁ ছিলেন নরম মনের, কোমল স্বভাবের, সদাচারী, মহানুভব ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। ইসলাম গ্রহণের ক্রম অনুসারে তিনি ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, বা প্রথম তিন ব্যক্তির একজন। নবি ﷺ-এর প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস ও সংশয়হীনতার কারণে তিনি "আস-সিদ্দীক" বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত হন। বিশেষত নবি ﷺ এক রাতের মধ্যে মক্কা থেকে আল-আকসা হয়ে সপ্ত আসমান ভ্রমণ করে আসার (ইসরা ও মিরাজ) কথা ঘোষণা করার পর আবু বকরের এই গুণ আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মুক্তহস্তে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে থাকেন। মুসলিম দাসদের কিনে কিনে মুক্ত করে দিয়ে নিপীড়ন থেকে রক্ষা করেন। তা ছাড়া পূর্ণ মাত্রায় সম্পদ ব্যয় করে জিহাদের অর্থায়ন করেন তিনি। আল্লাহর রাস্তায় নিজের সব টাকা দান করে দেওয়ার পর তাকে নবি ﷺ জিজ্ঞেস করেন যে ঘরে তিনি কী রেখে এসেছেন। আবু বকর ﵁-এর জবাব ছিল, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।" (সুনানুত তিরমিযি: ৩৬৭৫)। তিনি ছিলেন নবিজির ঘনিষ্ঠতম সাহাবি। মদীনায় হিজরতের সময় নবি ﷺ আবু বকরকেই বাছাই করেন নিজের একান্ত সঙ্গী হিসেবে। এটা ছিল মহান এক মর্যাদা। পরবর্তী

চতুর্থ অধ্যায়

বংশীয় খিলাফত

উমাইয়্যা খিলাফত এবং সংস্কারসমূহ
(৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ—৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ)

ভূমিকা

এই অধ্যায়ের আলোচ্য যুগটি বেশ কিছু কারণে আগ্রহোদ্দীপক। প্রথমত, এই যুগ থেকেই ইসলামি খিলাফতব্যবস্থা বংশীয় শাসনব্যবস্থার রূপ নেয়; দ্বিতীয়ত, এই যুগটি বিস্তৃত পরিসরে ইসলামি নগরায়ণের সাক্ষী। তৃতীয়ত, এই আমলে ইসলামি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সীমানার আরও বেশি সম্প্রসারণ ঘটে। এর ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় বাণিজ্যের আকৃতি; এবং চতুর্থত, এই সময়ে ইসলামি রাষ্ট্র মুদ্রানীতি সংস্কার করে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দ্রুততর ও সহজতর পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে একে আরও দক্ষ ও কার্যকর করে তোলে। উমাইয়্যা যুগই সম্ভবত তার পরবর্তী আব্বাসি খিলাফতের সময়কার উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথ খুলে দেয়।

খিলাফত এবং রাজবংশ

চতুর্থ খলিফায়ে রাশিদ আলি ﵁ ৬৬১ সালে গুপ্তহত্যার শিকার হতে না হতেই বৃহত্তর সিরিয়া তথা শাম প্রদেশের প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত মুআবিয়া ﵁ নিজেকে নতুন খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। আলির সমর্থকগণ তাঁর বড় ছেলে হাসান ﵁-কে বিগত খলিফার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করে আসছিল। মুআবিয়া ﵁-এর মতো সমপরিমাণের সামরিক সামর্থ্য না থাকা, আরও বেশি রক্তপাত প্রতিহত করার বাসনা এবং সম্ভবত রাজনীতির প্রতি খুব একটা আগ্রহ না থাকার কারণে অচিরেই পদত্যাগ করেন হাসান ﵁।

উমাইয়্যাদের ক্ষমতায় আরোহণ খিলাফত-ব্যবস্থায় এক নাটকীয় পরিবর্তনের

সূচনা ঘটায়: খিলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর-প্রক্রিয়া নির্বাচন থেকে পালটে পুরুষানুক্রমিক হয়ে যায়। (আত-তাবারি)।

মুআবিয়া ﷺ তার ছেলে ইয়াযিদকে মুসলিম উম্মতের পরবর্তী খলিফা হিসেবে বাছাই করে দিয়ে যান। তিনি দাবি করেন যে, এটি নতুন খলিফা নির্বাচনকে ঘিরে রক্তপাত পরিহার করতে সহায়তা করবে। তা ছাড়া নির্বাচন-পদ্ধতির ভিত্তিও এতে অগ্রাহ্য হচ্ছে না, কারণ নতুন খলিফাকে অনুমোদন লাভের জন্য মুসলিমদের থেকে আনুগত্যের শপথ এমনিতেও পাওয়া লাগবে। এই গেল তত্ত্ব, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। মুআবিয়া ﷺ -এর সিদ্ধান্তের কারণে ভাবি খলিফা হিসেবে নিজের ছেলের অনুমোদন নিশ্চিতই হয়ে যায়।

পিতার মৃত্যুর পর ইয়াযিদের ক্ষমতায় আরোহণের সময়ে ইরাকে একটি এবং হিজাযে আরেকটি বিদ্রোহ ফুঁসে ওঠে। খলিফা আলি ﷺ-এর ছোট ছেলে হুসাইনের নেতৃত্বাধীন ইরাকি বিদ্রোহ অল্প সময়ের মাঝেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ইরাকিরা হুসাইনের প্রতি সমর্থন তুলে নেওয়ার পর সিরীয় সেনাবাহিনী ৬৮০ সালে হুসাইন ও তাঁর পরিবারকে গণহত্যা করে। হিজাযের বিদ্রোহের জের ধরে ৬৮৩ সালে একটি আক্রমণ সংঘটিত হয় মদীনায়। ফলে সিরীয় সৈনিকরা তিন দিন ধরে লুট করে শহরটি। মক্কা শহরও অবরোধ এবং বিশাল পাথরবাহী গুলতি জাতীয় কামান দিয়ে আক্রমণের শিকার হয়। পুড়ে যায় পবিত্র কাবা ঘরও। অবশেষে ৬৯২ সালে সর্বশেষ বিরোধিতাকারীদের জোরপূর্বক দমন করার মাধ্যমে শান্তি পুনরুদ্ধার করা হয় হিজাযে। স্থানীয় সংঘাত মাথাচাড়া দিলে সেগুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় প্রচণ্ডভাবে। প্রাদেশিক প্রশাসক হাজ্জাজ হুমকি দিতেন, "মাথাগুলো দেখছি কাটার জন্য পেকে আছে। আমিই সেগুলো পেড়ে নেব" এবং "অবাধ্য উটকে যেভাবে পেটানো হয়, সেভাবে পেটাব তোমাকে"। (আত-তাবারি)। এরকম মানুষদের উপস্থিতিতে ভীতির ফলাফল হিসেবে শান্তি একসময় পুনরুদ্ধার হয়েই যায়।

মুআবিয়ার পর বংশীয় খিলাফত একটি ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা হওয়ার বদলে সাধারণ নিয়ম হয়ে ওঠে। পরবর্তী উমাইয়্যা শাসকদের মধ্যে নাটকীয় না হলেও আরও একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দেয়: খলিফা আর জনগণের সাথে মেশেন না (কিংবা গাছের নিচে ঘুমান না, যেমনটি এক বিদেশী প্রতিনিধিদল উমর ﷺ-কে করতে দেখেছিল)। নিজেদেরকে তারা রাখেন দূরে দূরে, সভাসদ-বেষ্টিত অবস্থায়। নামাজের জামাতে আসেন প্রহরীদের প্রহরায় এবং উদযাপন করতে থাকেন নানা উপলক্ষের উৎসব। মুসলিমদের চোখে, উমাইয়্যা খিলাফত আর খিলাফত না হয়ে বরং রাজ্য তথা "মুলক" ব্যবস্থার সূচনা ঘটায় (Hitti, 1963)।

নবি ﷺ-এর চাচা আব্বাস ﷺ-এর বংশধর আরেক রাজবংশ আব্বাসিরা প্রায় নব্বই বছর পর উমাইয়্যা রাজবংশকে উৎখাত করে। খিলাফত বা রাজ্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে আব্বাসিদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে খুরাসান ও ইরাকে প্রভাব বিস্তার করে তারা। মিত্রতা গড়ে তোলে উমাইয়্যাদের সুদীর্ঘকালীন শত্রু আলাবিদের সাথে (আত-তাবারি)। আব্বাসিদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খলিফা আবুল আব্বাস (৭৫০–৭৫৪)। তার উপাধি ছিল দ্ব্যর্থবোধক, আস-সাফ্ফাহ বা মহানুভব। অথবা, শত্রুদের সাথে তিনি যে ধরনের আচরণ করেন, সে হিসেবে অর্থ রক্তপাতকারী। আব্বাসি শাসনের শিখরে, বিশেষত হারুনুর রাশীদের শাসনামলে (৭৮৬–৮০৯) ইসলামি সাম্রাজ্য তার স্বর্ণযুগে গিয়ে পৌঁছায়।

তবে আব্বাসি খিলাফত কয়েকটি বিপদের শিকারও হয়েছে। এর শুরুটা হয় খিলাফতের প্রশ্নে রাশীদের দুই ছেলের মাঝে গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। কেউ কেউ এটিকে দেখেন পারস্য ও আরবদের মাঝে বিবাদ হিসেবে। পারস্য মায়ের সন্তান মামুনের সমর্থক ছিল পারসিকরা, আর আরব মায়ের সন্তান আল-আমিনের সমর্থক ছিলেন আরবরা (Hassan, 1959)। আব্বাসি খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়লে সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। স্বাধীন রাজবংশীয় সরকার প্রতিষ্ঠায়ও সফল হয় কেউ কেউ। এর ফলে সাম্রাজ্যের অঙ্গহানি ঘটে এবং দুর্বলতর হয়ে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার। মজার ব্যাপার হলো, এই স্থানীয় রাজবংশগুলো কেন্দ্রীয় খিলাফত থেকে স্বাধীন হলেও তারা খলিফার সাথে প্রতীকিভাবে ধর্মীয় সংযোগ অটুট রাখে। অথচ খলিফা ততদিনে নামেমাত্র প্রধান। সে সময়ে খলিফা আল-মুতামিদ (৮৭০–৮৯২) আফসোস করে বলেছিলেন, "খলিফার নামে রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে অথচ খলিফা সেখান থেকে একটা পয়সাও পান না। অদ্ভুত না!" (প্রাগুক্ত)। সময়ে সময়ে খলিফা রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে উঠে দাঁড়াতেন, কিন্তু সেটা সবসময় ধারাবাহিকতাপূর্ণ ছিল না। কারণ সেটা নির্ভর করত তুর্কি সেনাবাহিনীর সেনাপতি, সুলতান, এবং খলিফার ক্ষমতার আপেক্ষিক পরিমাণের ওপর (Lapidus, 2002)।

কালক্রমে ইসলামি সাম্রাজ্যের ওপর বহিঃশক্তির আক্রমণ আসতে থাকে। এর প্রথমটি ছিল ১০৯৬ সালের প্রথম ক্রুসেড। কিন্তু চূড়ান্ত আঘাতটা আসে মঙ্গোলদের থেকে, যারা ১২৫৮ সালে বাগদাদ দখল করে সর্বশেষ আব্বাসি খলিফাকে হত্যা করে। ইসলামি সাম্রাজ্যে বিশেষত আব্বাসি শাসনকালের শেষ পর্যায়ে এত রাজনৈতিক সংঘাত সত্ত্বেও এই যুগ শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ উন্নয়নের সাক্ষী। নিচে তা আলোচিত হলো।

❑ ইসলামি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ এবং প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

উমাইয়্যা শাসনামলে ইসলামি ভূখণ্ডের সম্প্রসারণ তিনটি প্রধান দিকে ঘটতে থাকে—উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব। উত্তরের যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামি নৌবহরের বিকাশের ফলে রাষ্ট্র ভূমধ্যসাগরে বাইজেন্টাইনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। সাগরের দিক থেকে বাইজেন্টাইন রাজধানী কন্সটান্টিনোপলকে অবরুদ্ধ করে রাখার সক্ষমতাও অর্জিত হয় এতে। রাজধানীটি ৬৬১ থেকে ৭১৪ সাল পর্যন্ত তিনবার অবরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু এটি একবারও আত্মসমর্পণ করেনি। অবশেষে বাইজেন্টাইন রাজধানী দখল এবং কন্সটান্টিনোপলের শাসককে উৎখাত করা হয়, ১৪৫৩ সালে দ্বিতীয় মুহাম্মাদ "ফাতিহ" (বিজেতা)-এর নেতৃত্বে তুর্কিদের হাতে। যা-ই হোক, উমাইয়্যা শাসনাধীনে মুসলিম সেনাবাহিনী কিছু কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ নিজেদের দখলে আনতে সফল হয়—সাইপ্রাস, রোডস এবং ক্রিট। এর ফলে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যপথ আংশিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে (Hitti, 1963)। উত্তরের চেয়ে পশ্চিম দিকে মুসলিমরা আরও দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য লাভ করে। ৬৮২ সালের মাঝে উত্তর আফ্রিকায় বাইজেন্টাইনরা পরাজিত হয় এবং ইসলামি সেনাবাহিনী উত্তর আফ্রিকার উপকূলে ঢুকে পড়ে আটলান্টিক পর্যন্ত। তবে এখানকার অধিবাসী বার্বার জাতির একটি বিদ্রোহের কারণে কিছু বছরের জন্য উত্তর আফ্রিকা উমাইয়্যা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ৭০৫ সালের মধ্যে উত্তর আফ্রিকান উপকূল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পুনরুদ্ধার হয় এবং অঞ্চলটির ওপর স্থায়ীভাবে কর্তৃত্ব লাভ করে উমাইয়্যাগণ (প্রাগুক্ত)।

উত্তর আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণ এবং ইসলামি সেনাদলে বার্বারদের সফল সংযোজনের সাহায্যে ইসলামি শাসন স্পেনের ইবেরিয়ান উপদ্বীপ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মুসলিম অভিযান ৭১১ সালে ভূমধ্যসাগরীয় প্রণালি অতিক্রম করে উপদ্বীপে ঢুকে পড়ে। আরও শক্তিবৃদ্ধির পর বার্বার আরব সেনাদলের হাতে পতন ঘটে ভিসিগথিক সাম্রাজ্যের (Hassan, 1959)। কিন্তু টুরস ও পয়টিয়ার্সের মাঝে ৭৩২ সালে মুসলিম সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখে দেন কার্ল মার্টেল। পূর্বদিকে উমাইয়্যা খলিফাগণ তাদের সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখেন। ইরাকের বিদ্রোহকে সফলভাবে দমন করার পর তারা পূর্বদিকে দুটি সেনাদল প্রেরণ করেন: একটি খুরাসান থেকে অগ্রসর হয় সিন্ধু উপত্যকার দিকে। অপরটি যায় খুরাসানের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, মাওয়ারাউন্নাহর বা ট্রান্সঅক্সিয়ানার দেশগুলোতে। ইসলামি জয়যাত্রা ৭১৩ সালের মাঝে সিন্ধুর নিম্ন উপত্যকা ও বদ্বীপে পৌঁছে যায়। দখল করে উত্তরে মুলতান, লাহোর ও কাঙ্গারা, এবং ভারত মহাসাগরের আদ-দাইবুল। ট্রান্সঅক্সিয়ানার যুদ্ধক্ষেত্রে বালখের পতন

হয় ৭০৫ সালে, বুখারা বিজিত হয় ৭০৯-এ, এবং সমরকন্দ, খাওয়ারিজম ও ফারগানাকে আরব শাসনাধীনে আনা হয় ৭১৫-তে। আব্বাসিদের অধীনে ৭৫১ সালে তাসখন্দ পদানত করার পর মুসলিমরা তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে মধ্য এশিয়ায় (প্রাগুক্ত)। রাজনৈতিক বাধা সরে যাওয়ায় এবং বাণিজ্যপথের নিরাপত্তা ও বিকাশ নিশ্চিত হওয়ায় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে সুবিধা আসে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে তৈরি হয় ব্যবসায়িক যোগাযোগ। একটু পরেই এর আলোচনা আসবে।

প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার

উমাইয়্যা যুগটি এর অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মুআবিয়া ﷺ কিন্তু কিছু প্রশংসনীয় প্রশাসনিক উদ্যোগের কৃতিত্বের দাবিদার। ডাকব্যবস্থা আল-বারীদ প্রচলন, নিবন্ধন বিভাগ প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের আরবিকরণ, এবং মুদ্রা সংক্রান্ত ও অপর কিছু সংস্কার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। নিবন্ধন ব্যবস্থাটি পরবর্তী উমাইয়্যা ও আব্বাসি শাসনামলে সুবিন্যস্ত রাষ্ট্রীয় দপ্তরে পরিণত হয়।

ডাকসেবার প্রচলন

ডাকব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল খলিফাকে তার প্রাদেশিক প্রশাসকদের সাথে দ্রুত ও সুসংগঠিত উপায়ে সংযুক্ত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সেবা করা। কিন্তু ভালোরকম খরচের বিনিময়ে সাধারণ জনগণের কাছেও এই সেবা বর্ধিত করা হয়। বিভিন্ন সড়কে বারো মাইল দূরত্ব পরপর ডাককেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সেখানে তাগড়া প্রাণী প্রস্তুত থাকত ডাক বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পারস্যের জন্য খচ্চর আর ঘোড়া, সিরিয়া ও আরবের জন্য উট। আকাশ ডাকব্যবস্থার মাধ্যম হিসেবে কবুতরও ব্যবহৃত হয়েছে। ডাকব্যবস্থা রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে পরিণত হয়। এমনকি উমাইয়্যা খলিফা আবদুল মালিক (৬৮৫–৭০৫) তার এক উজিরকে বলেছেন, "প্রশাসনিক বিষয়াদির সবকিছুই আমি আপনার হাতে অর্পণ করে দিচ্ছি। শুধু চারটি জিনিস বাদে: মুআয্যিন, কারণ সে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী; রাতের ঘোষক, কারণ তার ঘোষণা এতটা জরুরি না হলে সে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েই কাটাতে পারত; ডাকব্যবস্থা, কারণ ডাক পৌঁছাতে দেরি হলে মানুষের পরিকল্পিত যাত্রা ভণ্ডুল হয়ে যায়; এবং খাদ্যসামগ্রী" (Hassan, 1959)।

আব্বাসি যুগে ডাকসেবাকে আরও সুসংগঠিত করা হয়। রাস্তার নকশা রাখা হতো রাজধানী বাগদাদে প্রধান ডাকদপ্তরে। এর ফলে মুসাফির, বণিক, হজযাত্রী